ISSN 1021-2078

ডায়রিয়া ... ৩
নিরাপদ প্রসব ... ৩
যক্ষ্মা থেকে রক্ষা ... ৫

স্বাস্থ্য সংলাপ

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ

বর্ষ ৩ সংখ্যা ১ বৈশাখ ১৪০১

ইউনিসেফ-এর নির্বাহী পরিচালক জেমস্ পি. গ্র্যান্ট প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন। পার্শ্বে উপবিষ্ট কেন্দ্রের পরিচালক প্রফেসর ডেমিসি হাবতে।

খাবার স্যালাইনের ২৫ বছর পূর্তি

সংলাপ রিপোর্ট

খাবার স্যালাইন আবিস্কারের ২৫ বছর পূর্তি উদ্‌যাপিত হচ্ছে এ বছর। এই উপলক্ষে গত ৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকাস্থ আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া খাবার স্যালাইন বা ওরাল রিহাইড্রেশন সলিউশন (ওআরএস) উদ্ভাবনকে এক উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশে উদ্ভাবিত হলেও মানব কল্যাণে সারা বিশ্বে এটি ব্যবহৃত হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, খাবার স্যালাইনের সফলতা আমাদের নবতর দিক নির্দেশনা দিয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, আই.সি.ডি.ডি.আর,বি স্বাস্থ্য সংক্রান্ত গবেষণা কর্ম অব্যাহত রাখবে এবং নবতর ও যথোপযুক্ত প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে সমর্থ হবে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় আই.সি.ডি.ডি.আর,বি-এর প্রতি তাদের সমর্থন অব্যাহত রাখবে। বাংলাদেশ সরকারও সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে বলে তিনি প্রতিশ্রুতি দেন।

অনুষ্ঠানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ডায়রিয়া এবং এ.আর.আই বিভাগের পরিচালক ডঃ জেমস টুলোক, ইউএসএআইডি (USAID)-এর সহকারী প্রশাসক মার্গারেট কার্পেন্টার, ইউএনডিপি-এর প্রশাসক জেমস গুস্তাভ স্পেথ, ইউনিসেফ-এর নির্বাহী পরিচালক জেমস পি. গ্র্যান্ট, বাংলাদেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ, স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী মোঃ সিরাজুল হক, ব্র্যাক-এর নির্বাহী পরিচালক ফজলে হাসান আবেদ, আই.সি.ডি.ডি.আর,বি-এর পরিচালক অধ্যাপক ডেমিসি হাবতে ও স্বাস্থ্য সচিব সৈয়দ শামীম আহসান বক্তব্য রাখেন। খাবার স্যালাইনকে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য ব্র্যাক, বাংলাদেশ সরকার, ইউনিসেফ, ইউএনডিপি, ইউএসএআইডি এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে পুরস্কৃত করা হয়। আই.সি.ডি.ডি.আর,বি-এর পক্ষে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি প্রধানমন্ত্রী পুরস্কার প্রদান করেন। ব্র্যাক-এর নির্বাহী পরিচালক ফজলে হাসান আবেদ, বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে স্বাস্থ্যমন্ত্রী চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ, ইউনিসেফ-এর নির্বাহী পরিচালক জেমস পি. গ্র্যান্ট, ইউএনডিপি-এর প্রশাসক জেমস গুস্তাভ স্পেথ, ইউএসএআইডি-এর সহকারী প্রশাসক মার্গারেট কার্পেন্টার এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ডঃ জেমস টুলোক তাঁদের নিজ নিজ সংস্থাসমূহের পক্ষে প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেন। প্রধানমন্ত্রী খাবার স্যালাইন উদ্ভাবনের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত একটি স্মারক ডাক টিকেটও উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীকে ওআরএস-এর প্রতীক উপহার দেয়া হয়।

খাবার স্যালাইন উদ্ভাবনের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ তারিখে আই.সি.ডি.ডি.আর,বি-এর সাসাকাওয়া সম্মেলন কেন্দ্রে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে আই.সি.ডি.ডি.আর,বি-এর পরিচালক অধ্যাপক ডেমিসি হাবতে বলেন, খাবার স্যালাইন বিভিন্ন দেশের ডায়রিয়া রোগ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। তিনি বলেন, এর জন্য যে শুধু লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন রক্ষা পাচ্ছে তাই নয়, বছরে ৬ কোটি ডলারও সাশ্রয় হচ্ছে। সাংবাদিক সম্মেলনে আই.সি.ডি.ডি.আর,বি-এর সহযোগী পরিচালক ডাঃ দিলীপ মহলানবীশ, উপদেষ্টা চিকিৎসক ডাঃ আহমেদ এন. আলমসহ উর্ধতন চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

তৃতীয় বার্ষিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলন

আই.সি.ডি.ডি.আর,বি–এর দু'দিন ব্যাপী তৃতীয় বার্ষিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো গত ১৫ ও ১৬ জানুয়ারী কেন্দ্রের সাসাকাওয়া সম্মেলন কক্ষে। প্রধান অতিথি হিসেবে সম্মেলন উদ্বোধন করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আই.সি.ডি.ডি.আর,বি–এর পরিচালক অধ্যাপক ডেমিসি হাবতে, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সচিব ডঃ মোহাম্মদ হারুনুর রশীদ, বিশ্ব ব্যাংকের মিশন প্রধান মিঃ ক্রিস্টোফার আর. উইলাগবি, সুইস ডেভেলপমেন্ট কোঅপারেশনের প্রধান ডক্টর পিটার অরনলড ও সম্মেলনের সাংগঠনিক সম্পাদক ডক্টর বিলকিস আমিন হক বক্তব্য রাখেন। মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন লন্ডন স্কুল অব হাইজিন এন্ড ট্রপিক্যাল মেডিসিনের ডীন এবং পরিবেশ ও স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রখ্যাত বিজ্ঞানী প্রফেসর আর.জি. ফিচেম। বিভিন্ন এনজিও, ইউএন এজেন্সীর প্রতিনিধি, বাংলাদেশ, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিসহ ৩৫০ জন সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশস্থ ইউএনডিপি–এর আবাসিক প্রতিনিধি ডঃ এইমি ওয়াতানাবে। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় সচিব সৈয়দ আলমগীর ফারুক চৌধুরী। সম্মেলনে স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও ডায়রিয়া প্রতিরোধের উপর বিভিন্ন সুপারিশ করা হয়।

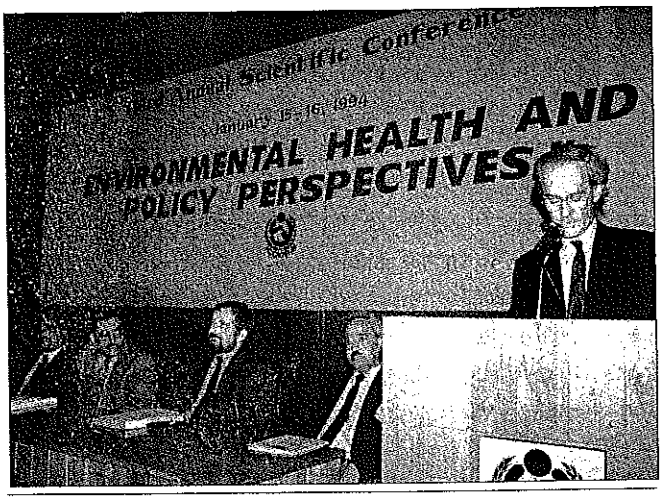

দীর্ঘমেয়াদী ডায়রিয়া

উন্নয়নশীল দেশসমূহে দীর্ঘমেয়াদী ডায়রিয়া (persistent diarrhoea) ইতিমধ্যেই একটি গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী ডায়রিয়ার চিকিৎসা ও প্রতিরোধে তীব্র ধরনের ডায়রিয়া (acute diarrhoea) অপেক্ষা কম মনযোগ দেয়া হয়। দীর্ঘমেয়াদী ডায়রিয়ার চিকিৎসা ও প্রতিরোধ সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা এ রোগের প্রতিরোধকল্পে বহুবিধ সুপারিশ ও নির্দেশনা দিয়েছেন। এ ব্যাপারে ১৯৯১ সালে কেনিয়ার মোম্বাশায় অনুষ্ঠিত এক বিশেষজ্ঞ সমাবেশে দীর্ঘমেয়াদী ডায়রিয়ার চিকিৎসা, প্রতিরোধ ও গবেষণা সংক্রান্ত একটি বিশদ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। দীর্ঘমেয়াদী ডায়রিয়া উন্নয়নশীল দেশে শিশুর রোগ ও শিশু মৃত্যুর অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তীব্র ধরনের ডায়রিয়া খাবার স্যালাইন বা ওরাল রিহাইড্রেশন থেরাপি (ORT)–এর মাধ্যমে সাফল্যজনকভাবে চিকিৎসা করা হচ্ছে। অপরদিকে দীর্ঘমেয়াদী ডায়রিয়ায় মৃত্যু হার ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। ১৯৮০–এর দশকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) স্বীকার করে যে দীর্ঘমেয়াদী ডায়রিয়া রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে পর্যাপ্ত পরিমাণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এ রোগ প্রতিরোধে ৮০–এর দশক হতেই বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম চালনা করা হচ্ছে যাতে এ রোগের চিকিৎসা ও প্রতিরোধে একটি কার্যকর পদ্ধতি প্রবর্তন করা সম্ভব হয়।

দীর্ঘমেয়াদী ডায়রিয়া কি?

সাধারণতঃ তীব্র ধরনের পাতলা পায়খানা এক সপ্তাহেরও কম সময় পর্যন্ত স্থায়ী হয়। কিন্তু অল্প সংখ্যক রোগীর ক্ষেত্রে পাতলা পায়খানা অব্যাহত থাকতে পারে। যখন তীব্র ধরনের ডায়রিয়া দু'সপ্তাহ মেয়াদ উত্তীর্ণ করে তখন তাকে দীর্ঘমেয়াদী ডায়রিয়া বলে। ১৯৮৭ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত এক বৈঠকে দীর্ঘমেয়াদী ডায়রিয়ার এই সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। এই সংজ্ঞাটি বেশীরভাগ গবেষণা ও কর্মসূচীতে গৃহীত হয়েছে।

দীর্ঘমেয়াদী ডায়রিয়া সমস্যার গুরুত্ব ও ব্যাপকতা

এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকায় পরিচালিত ৮টি গবেষণায় প্রতীয়মান হয়েছে যে ডায়রিয়া রোগে আক্রান্তদের মধ্যে শতকরা ৩ হতে ২৩ ভাগ পর্যন্ত রোগী দীর্ঘমেয়াদী ডায়রিয়ায় ভোগে। আরও বিভিন্ন গবেষণায় দেখানো হয়েছে যে দীর্ঘমেয়াদী ডায়রিয়া সংক্রমণের হার ক্ষেত্রবিশেষে পার্থক্য হয়ে থাকে। ৪ বছর অথবা ৪ বছরের কম বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে প্রতি ১০০ জনের মধ্যে ৭ জন দীর্ঘমেয়াদী ডায়রিয়ায় ভোগে ভারতে এবং ১৫০ জনের মধ্যে ৭ জন ভোগে উত্তর পূর্ব ব্রাজিলে। তবে ২ বছরের কমবয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে আক্রান্তের হার আরও বেশী। WHO এবং UNICEF–এর ১৯৯১ সালের এক হিসেবে বলা হয় যে মোট ডায়রিয়া রোগের ক্ষেত্রে শতকরা ১০ ভাগ দীর্ঘমেয়াদী ডায়রিয়ার রোগী এবং ডায়রিয়াজনিত মৃত্যুর মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী ডায়রিয়ার কারণে মৃত্যুহার শতকরা ৩৫ ভাগ (৫ বছরের কম বয়সী)। কিন্তু বাংলাদেশ, ভারত, পেরু এবং ব্রাজিলের পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় যে ডায়রিয়াজনিত মৃত্যুর মধ্যে শতকরা ২৩ হতে ৬২ ভাগ মৃত্যু ঘটে দীর্ঘমেয়াদী ডায়রিয়ার কারণে। সাধারণতঃ আক্রান্তদের বয়স ২ বছরের মধ্যে থাকে। মৃত্যুবরণকারী বেশীরভাগই ১ হতে ৪ বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কারণ এ সময় শিশুদের অপুষ্টিজনিত সমস্যাও বেশী থাকে।

দীর্ঘমেয়াদী ডায়রিয়ার কারণ

বিভিন্ন গবেষণায় প্রতীয়মান হয়েছে যে বিশেষ কয়েক ধরনের জীবাণু দীর্ঘমেয়াদী ডায়রিয়া সংক্রমণের জন্য দায়ী। বাংলাদেশ এবং পেরুতে পরিচালিত ৪টি জরীপে দেখা গিয়েছে যে রোটাভাইরাস, এরোমোনাস, ক্যামপাইলোব্যাকটার, সিগেলা এবং জিয়ারডিয়া ল্যামব্লিয়া তীব্র (acute) এবং দীর্ঘমেয়াদী ডায়রিয়া রোগ সৃষ্টির জন্য সমভাবে দায়ী। বাংলাদেশে ক্রিপ্টোস্পোরিডিয়াম নামক জীবাণু তীব্র ডায়রিয়া অপেক্ষা দীর্ঘমেয়াদী ডায়রিয়া অধিক সৃষ্টি করে থাকে। কিন্তু পেরুতে এ অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। এছাড়া এন্টারোএডহেরেন্ট ই. কলাই অনেকক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী ডায়রিয়া সৃষ্টি করতে পারে।

আমাদের দেশে বিশেষ করে গ্রাম অঞ্চলে বেশীরভাগ মায়ের সন্তান প্রসব করানো হয় বাড়ীতে। বাড়ীর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের ফলে নানারকম সংক্রামক রোগ হয়। ফলে প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মা ও শিশু মৃত্যুবরণ করছে। ইউনিসেফ-এর এক রিপোর্টে বলা হয়েছে যে আমাদের দেশে প্রতি বছর প্রায় ৪০ লক্ষ মহিলা গর্ভধারণ করে যার ৯০ ভাগ সন্তান প্রসব হয় বাড়ীতে অদক্ষ দাই বা আত্মীয়দের সাহায্যে। এসব দাই বা আত্মীয়রা তাঁদের নিজস্ব প্রথা, বিশ্বাস ও সনাতন পদ্ধতির মাধ্যমে সন্তান প্রসব করান বা করার চেষ্টা করেন।

মায়েদের মৃত্যুর কারণসমূহের মধ্যে অন্যতম প্রধান কারণ হলো প্রসব পরবর্তী রক্তক্ষরণ, সংক্রামক রোগ, অনাকাংখিত গর্ভপাত এবং জটিল প্রসব অবস্থা। একইভাবে শিশু মৃত্যুর কারণগুলোর মধ্যে অপুষ্টি, ধনুষ্টংকার এবং জন্মের সময়কালীন আঘাত ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই বিরাট সংখ্যক মৃত্যু হ্রাস করা যেতে পারে দু'ভাবে : (১) প্রসবের সময় নিরাপদ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং (২) প্রসবকালীন সময়ে জটিল অবস্থার সৃষ্টি হলে সময়মত হাসপাতালে প্রেরণের মাধ্যমে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে গ্রামের দাইদের মা ও শিশু স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ সরকার দাই প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণ করে ১৯৭৮ সালে। এই প্রশিক্ষণের আওতায় দাইদেরকে মা ও শিশু স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যত্ন বিশেষ করে একজন মায়ের গর্ভাবস্থা সনাক্তকরণ থেকে গর্ভকালীন যত্ন, প্রসবকালীন ও প্রসবোত্তর যত্ন সংক্রান্ত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির উপর বিশেষ প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর বিশেষ উদ্দেশ্য হলো:

১. স্বাভাবিক ও নিরাপদ প্রসব করানোর জন্য দাইদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির করা।

২. প্রসবকালীন ও প্রসব পরবর্তী জটিলতা সনাক্ত করা এবং সময়মত মাকে স্বাস্থ্য কেন্দ্র বা হাসপাতালে প্রেরণ করা।

৩. গর্ভকালীন সময়ে অস্বাভাবিক ও ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভাবস্থা সনাক্ত করা এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রেরণ করা।

৪. প্রচলিত ক্ষতিকর প্রসব পদ্ধতি চিহ্নিত করা এবং তা সংশোধন করা।

৫. শিশুকে বুকের দুধ বিশেষ করে শাল দুধ খাওয়ানো এবং এ সম্পর্কে মাকে উদ্বুদ্ধ করা, টিকা দান এবং vitamin A প্রদান সম্পর্কে উদ্বুদ্ধকরণ।

এই কর্মসূচী অনুযায়ী একজন দাইকে উল্লিখিত বিষয়ে ব্যাপক প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং অস্বাস্থ্যকর ও অপরিস্কার অবস্থায় সন্তান প্রসব করলে যেসব জটিলতা বা রোগের সৃষ্টি হতে পারে সেসব বিষয় জানানো হয়। অস্বাস্থ্যকর ও অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে প্রসব করলে এবং নাড়ি কাটার সময় অপরিস্কার ব্লেড বা ছুরি ব্যবহার করলে মা ও নবজাতকের ধনুষ্টংকার হতে পারে এবং ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

প্রসবকালীন জটিল অবস্থা সম্পর্কেও তাঁদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় যাতে তাঁরা জটিল অবস্থাগুলো চিহ্নিত করতে পারেন। যেমন যদি প্রসবের সময় শিশুর এক হাত বা এক পা বা নাড়ী আগে বের হয়ে আসে,

যদি অতিরিক্ত রক্তপাত হয় বা ১ দিনের বেশী প্রসব ব্যাথা থাকে ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাড়ীতে অপেক্ষা না করে সাথে সাথে নিকটবর্তী হাসপাতালে প্রেরণ করার জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। তাছাড়া একজন গর্ভবতী মাকে নিরাপদ প্রসবের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেমন পরিস্কার কাপড়, সুতা, ব্লেড ইত্যাদি আগে থেকেই সংগ্রহ করে রাখার বিষয়ে উপদেশ দেয়ার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে, নিরাপদ প্রসবে একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাইয়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া তাঁরা একই এলাকায় বাস করেন এবং মায়েদের পূর্ব পরিচিত বলে আস্থাভাজন ব্যক্তিত্ব।

সরকারী দাই প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে একজন দাই বছরে ১৫টা প্রসব করাবেন বলে নির্ধারণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচীর অধীনে প্রতিটি ওয়ার্ডে ৫ জন করে প্রতি ইউনিয়নে মোট ১৫ জন দাইকে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে এবং এখন পর্যন্ত প্রায় ৩৩,০০০ হাজার দাইকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ধাত্রী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সম্পর্কে দাইদের জ্ঞানের পরিধি যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনিভাবে প্রচলিত সামাজিক ক্ষতিকর ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাস সম্পর্কেও তাঁরা উপলব্ধি করতে পারছেন। ব্র্যাক, সিসিডিবি ও আই.সি.ডি.ডি.আর,বি-এর বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে দাইদের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে ধারণা, যেমন: প্রসবে সহায়তা করার আগে ভালভাবে হাত ধোয়া, নিজে পরিস্কার কাপড় পরা এবং প্রসবের মাকে পরানো, পরিস্কার জায়গায় প্রসব করানো, পরিস্কার ও জীবাণুমুক্ত ব্লেড দিয়ে নাভি কাটা ও পরিস্কার জীবাণুমুক্ত সুতা দিয়ে নাভি বাঁধা, যাতে করে সংক্রামক রোগে মা ও শিশু আক্রান্ত হতে না পারে। এসব ব্যাপারে তাঁদের জ্ঞানের অনেক উন্নতি হয়েছে এবং এতে আশা করা যায় যে বেশীর ভাগ প্রসব স্বাস্থ্যকর পরিবেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাইদের দ্বারা করানো হবে।

ICDDR,B-এর MCH-FP সম্প্রসারিত প্রকল্পের একটি গবেষণালব্ধ ফলাফলে দেখা যায় যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাই সম্পর্কে এলাকাবাসীদের তেমন ধারণা নেই। অনেক ক্ষেত্রে সেসব দাইকে (প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত) এলাকাবাসী হয়তো চিনেন, কিন্তু তাঁর প্রশিক্ষণের ব্যাপারে ততটা সচেতন নন। সাধারণতঃ যেসব দাইরা পরিচিত বাড়ীর কাছাকাছি বাস করেন তাঁদেরকেই বেশী ডাকা হয়। ফলে প্রতিবেশী

দীর্ঘমেয়াদী ডায়রিয়া সংক্রমণের ঝুঁকিপূর্ণ কারণসমূহ

দীর্ঘমেয়াদী ডায়রিয়া রোগ সংক্রমণের ঝুঁকি বৃদ্ধি পাওয়ার ক্ষেত্রে অনেকগুলো কারণ রয়েছে, যেমন ঃ

* ডায়রিয়ার অতীত সংক্রমণ (previous history of diarrhoeal infection)।

* পূর্বে যাদের ডায়রিয়া রোগ হয়েছে ঃ ইতিপূর্বে ডায়রিয়া রোগে আক্রান্তদের দীর্ঘমেয়াদী ডায়রিয়া সংক্রমণের ঝুঁকি বেশী।

* অপুষ্টিজনিত সমস্যা (malnutrition)।

বাংলাদেশ, ভারত এবং ব্রাজিলে পরিচালিত গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে অপুষ্টিজনিত কারণে ডায়রিয়া সংক্রমণের হার কম হলেও অপুষ্ট শিশুদের ডায়রিয়া বা পাতলা পায়খানা বেশী দিন থাকে। বাংলাদেশে ডায়রিয়াজনিত শিশু মৃত্যুর শতকরা ৮১ ভাগ শিশুর মৃত্যু ঘটে দীর্ঘমেয়াদী ডায়রিয়ার কারণে।

* শিশুর খাদ্যাভ্যাস (feeding practice)

যেসব শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানো হয় সেসব শিশুদের পাতলা পায়খানা কম হয় এবং যেসব শিশুদের বুকের দুধ খাওয়ানো হয় না তাদের দীর্ঘমেয়াদী ডায়রিয়া হওয়ার ঝুঁকি বেশী থাকে। পেরুতে পরিচালিত গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে ৯ মাস হতে ১১ মাস বয়সী শিশুদের যাদের বুকের দুধ খাওয়ানো হয়নি তাদের গড় ডায়রিয়ার মেয়াদ বুকের দুধ পান করা শিশুদের তুলনায় শতকরা ৪৯ ভাগ বেশী।

* অন্যান্য কারণসমূহ (other factors)

দীর্ঘমেয়াদী ডায়রিয়া সংক্রমণের ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করতে গবেষণা অব্যাহত রয়েছে। দেখা যায়, ভিটামিন-এ (vitamin A), দস্তা (zinc), লৌহ (iron) এবং অন্যান্য মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস (micronutrients)-এর অভাব, দূষিত পানীয় জল পান এবং খাদ্য পরিবেশনে দূষিত পানির ব্যবহার, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, অন্যান্য রোগ যেমন হাম এবং শরীরে প্রয়োজনীয় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার অভাব থাকলেও দীর্ঘমেয়াদী ডায়রিয়া সংক্রমণের ঝুঁকি বেশী থাকে।

দীর্ঘমেয়াদী ডায়রিয়ার চিকিৎসা

তীব্র ও দীর্ঘমেয়াদী ডায়রিয়ার চিকিৎসায় একই ধরনের নিয়ম অনুসরণ করা হয়। প্রতিবার পাতলা পায়খানার সাথে শরীর হতে যে পরিমাণ পানি বের হয়ে যায় তা সঠিক পরিমাণে পূরণ করার মাধ্যমে চিকিৎসা করতে হবে। পাশাপাশি খাদ্যাভ্যাস ঠিক রাখা ও অপ্রয়োজনীয় ঔষধ পরিত্যাগ করতে হবে। দীর্ঘমেয়াদী ডায়রিয়ার ক্ষেত্রে সঠিক খাদ্য দিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ (dietary management) অত্যন্ত জরুরী। কারণ দীর্ঘমেয়াদী ডায়রিয়ার সাথে অপুষ্টি, ল্যাকটোজেন ইনটলারেন্স এবং মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস অভাবজনিত সমস্যার সম্পর্ক বিদ্যমান।

* ওরাল রিহাইড্রেশন থেরাপি (oral rehydration therapy)

খাবার স্যালাইন বা ওআরএস সেবনের মাধ্যমে পাতলা পায়খানার সাথে শরীর হতে বের হয়ে যাওয়া পানি ও ইলেক্ট্রোলাইটস-এর শূন্যতা পূরণ করা যায়। তীব্র ও দীর্ঘমেয়াদী ডায়রিয়া রোগ হলে পাতলা পায়খানা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত খাবার স্যালাইন খাওয়াতে হবে। দীর্ঘমেয়াদী ডায়রিয়ার ক্ষেত্রে প্রায় সকল রোগীর জন্য খাবার স্যালাইনের মাধ্যমেই পানি শূন্যতা দূর করা হয়।

* ডায়েটারী ম্যানেজমেন্ট (dietary management)

পূর্বেই বলা হয়েছে যে অপুষ্ট শিশুদের ডায়রিয়ায় আক্রান্তের হার বেশী এবং দীর্ঘমেয়াদী পাতলা পায়খানাও অপুষ্ট (malnourished) শিশুদের ক্ষেত্রেই বেশী হয়। তাই পাতলা পায়খানা চলাকালে এবং পাতলা পায়খানা বন্ধ হওয়ার পরও শিশুকে অধিক পুষ্টিকর খাদ্য দিতে হবে।

* ঔষধের ব্যবহার (drugs)

কোন সুনির্দিষ্ট প্রয়োজন ছাড়া দীর্ঘমেয়াদী ডায়রিয়ায় এন্টিবায়োটিকস্ ব্যবহার করা উচিত নয়। তবে সিগেলা নামক জীবাণু দ্বারা ডায়রিয়া রোগ সংক্রমিত হলে নির্দিষ্ট 'এন্টিবায়োটিক' ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে। মলের বিশেষ পরীক্ষায় সিগেলার জীবাণু সনাক্ত হলে অথবা রক্তবর্ণের মল হলে এন্টিবায়োটিকস্ ব্যবহারেরও প্রয়োজন পড়ে।

(সংকলন : ডা: মোড়ল নজরুল ইসলাম)

নিরাপদ প্রসবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাই-এর ভূমিকা

পারভীন আক্তার খানম

দাই—এই শব্দটির সাথে আমারা সবাই কম বেশী পরিচিত। সাধারণতঃ যেসব মহিলা গর্ভবতী মায়েদেরকে গর্ভকালীন সময় থেকে প্রসবের পরবর্তী সময়ে সাহায্য-সহযোগিতা করেন তাঁদেরকে বুঝানো হয়ে থাকে। বিশেষ করে প্রসবকালীন সময়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ করানোর ব্যাপারে একজন দাই যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন তা সর্বজন স্বীকৃত। এসব দাই—যাঁদেরকে আধুনিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার আওতায় এনে প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে গড়ে তোলা হয় তাঁরাই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাই হিসেবে পরিচিত।

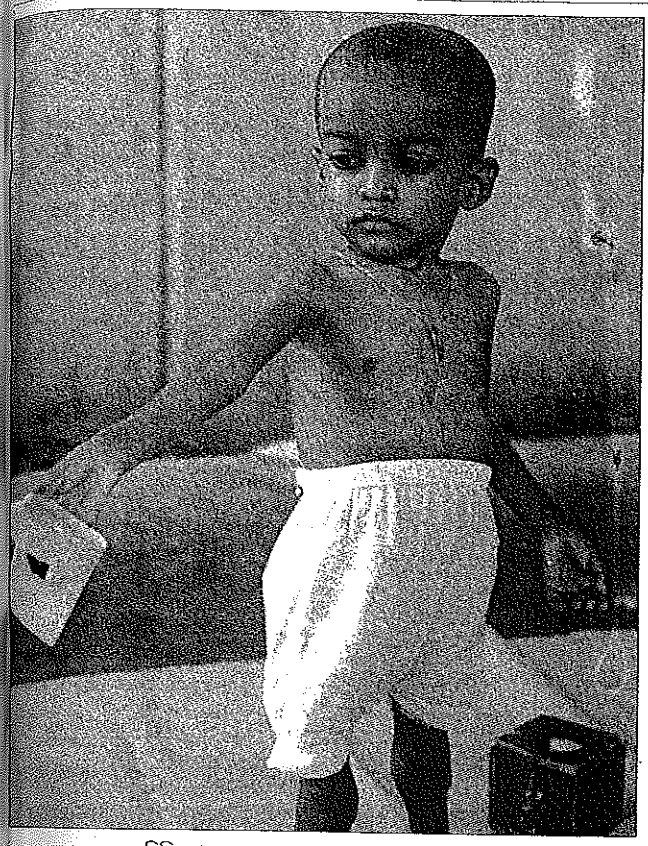

চিকিৎসা শুরুর এক মাস পর। ওজন : ৭.১ কেজি

লিনা সরেনসেন

চিকিৎসা শুরুর ৩ মাস পর। ওজন : ৯.৩ কেজি

যক্ষা ও বক্ষব্যাধি বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থার (International Union Against Tuberculosis and Lung Disease) এক পরামর্শ অনুযায়ী যক্ষা রোগের চিকিৎসা কয়েকভাবে করা যায়। নতুন রোগীকে ৬ মাস আইসোনায়াজিড ও রিফামপিসিন দিয়ে চিকিৎসা করা যায়। সেই সংগে প্রথম দু'মাস পাইরাজিনামাইড ঔষধটিও দিতে হবে। এ সবগুলো ঔষধই দৈনিক একবার করে খেতে হয়। তবে স্বাস্থ্যকর্মী নিজেরা যদি ঔষধ খাইয়ে দিতে পারেন, সেক্ষেত্রে প্রথম দু'মাস তিনটি ঔষধ প্রতিদিন খাওয়ানোর পর, পরবর্তী ৪ মাস শুধু আইসোনায়াজিড ও রিফামপিসিন সপ্তাহে ২ বা ৩ বার খাইয়ে দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। এই ব্যবস্থায় রোগী ঠিকমত ঔষধ খাচ্ছে কিনা তা সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা যায়। যক্ষা রোগে ব্যবহৃত বিভিন্ন ঔষধ ও তাদের মাত্রা ছকে দেখানো হলো :

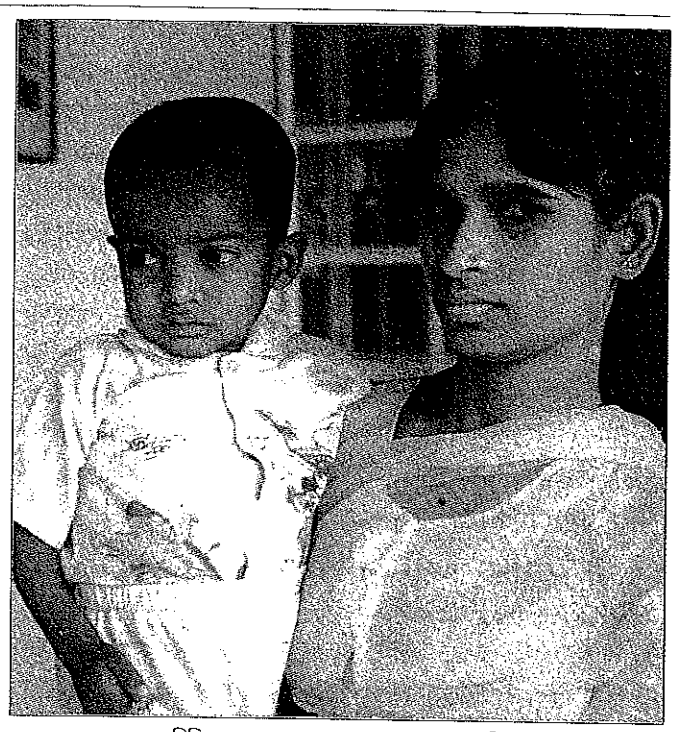

রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকার

যক্ষা রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকারের জন্য নিচের তিনটি বিষয় অত্যন্ত জরুরী ঃ

* রোগী সনাক্ত করা (সন্দেহজনক রোগী খুঁজে বিভিন্ন পরীক্ষা দ্বারা নিশ্চিত করা)।
* উপযুক্ত চিকিৎসা প্রদান বিশেষতঃ যাদের কফে জীবাণু পাওয়া যায়।
* শিশুর জন্মের সাথে সাথে তাকে বিসিজি টিকা দেয়া।

রোগী খুঁজে বের করা স্বাস্থ্যকর্মী ও রোগী উভয়েরই দায়িত্ব। কারো যদি অনেক দিন ধরে কাশি থাকে, ঘন ঘন জ্বর হয় অথবা ধীরে ধীরে ওজন কমে যেতে থাকে তাহলে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যোগাযোগ করে নিশ্চিত হতে হবে যক্ষা আছে কিনা। যেহেতু এ রোগ একজন থেকে আরেক জনের হয়ে থাকে, পড়শীদের উচিত এ ধরনের রোগীদের

ঔষধের নাম	প্রতিদিনের মাত্রা			সাপ্তাহিক মাত্রা (২/৩ বার)		
	শিশু (১৫ বৎসরের কম)	পূর্ণবয়স্ক রোগী		শিশু (১৫ বৎসরের কম)	পূর্ণবয়স্ক রোগী	
	(মি:গ্রা:/ কেজি)	ওজনে (কেজি)	মাত্রা (মি:গ্রা:)	(মি:গ্রা:/ (কেজি)	ওজনে (কেজি)	মাত্রা (মি:গ্রা:)
আইসোনায়াজিড	৫	–	৩০০	১৫	–	–
রিফামপিসিন	১০	<৫০	৪৫০	১৫	–	৬০০–৯০০
		≥৫০	৬০০			
স্ট্রেপটোমাইসিন	১৫–২০	<৫০	৭৫০	১৫–২০	<৫০	৭৫০
		≥৫০	১০০০		≥৫০	১০০০
পাইরাজিনামাইড	৩৫	<৫০	১৫০০	৫০–৭৫	<৫০	২০০০
		≥৫০	২০০০		≥৫০	২৫০০
ইথামবিউটল	২৫ (প্রথম ২ মাস) ১৫ (পরবর্তী পর্যায়ে)	—	—	৩০–৪৫		—

বা অদক্ষ দাইদের দিয়ে তাঁদের প্রসব করানো হয় যা মা ও শিশু স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাবে একদিকে যেমন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে প্রসব করানোর ফলে ধনুষ্টংকারের মত সংক্রামক রোগের বিস্তার হচ্ছে, তেমনি প্রসবকালীন জটিলতা সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকায় অহেতুক বাড়ীতে বিলম্বজনিত কারণে মা বা শিশু এবং কোন কোন ক্ষেত্রে উভয়কে ক্ষতিকর পরিণতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তাই এসব অনাকাংখিত মৃত্যু রোধ করার জন্য জনসাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেনতা সৃষ্টি করতে হবে। আর যতদিন পর্যন্ত না আধুনিক স্বাস্থ্যসম্মত মাতৃসদন চালু করা যায়, ততদিন পর্যন্ত এই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাইদের মাধ্যমে অধিক সংখ্যক প্রসব করানোর জন্য সচেষ্ট হতে হবে। জনসাধারণের মধ্যে এ ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনার মাঠ পর্যায়ের কর্মীদেরকে উদ্যোগী হতে হবে।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাইদের সম্পর্কে এলাকাবাসীকে জানানোর জন্য ঐ এলাকার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাইদের একটা তালিকা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে (FWC) লাগানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তাছাড়া স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন দলীয় সভায়, যেমন: বিআরডিবি গ্রুপ (BRDB Group) মাদার্স ক্লাব (Mothers Club), গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক বা অন্যান্য মহিলা দলের সভায় এসব প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাইদের ভূমিকা এবং ঠিকানা সম্পর্কে জানাতে হবে। প্রসবের সময় তাঁদের সাহায্য গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

উল্লিখিত অবস্থার সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে আরও অধিক সংখ্যক প্রসব প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাইদের দিয়ে করানো সম্ভব বলে আশা করা যায়। নিরাপদ প্রসব নিশ্চিত করতে পারলে মাতৃ ও শিশু মৃত্যুর হার অনেকটা কমে আসবে। এ ব্যাপারে ইউনিয়ন ও থানা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

যক্ষা থেকে রক্ষা

ডা: এস. আমিনুল ইসলাম
ডা: নাসিমা জে. আমিন

"যার হয় যক্ষা তার নেই রক্ষা"—কয়েক যুগ আগেও এ উক্তিটি ছিল মানুষের মুখে মুখে। বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে এখন আমাদের হাতে রয়েছে যক্ষা থেকে রক্ষা পাবার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা। তারপরও যক্ষা রয়ে গেছে গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম সমস্যা হিসেবে। আজও পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ লোক এ অসুখে ভুগছে। বাংলাদেশের মত তৃতীয় বিশ্বে যত লোক যক্ষা রোগে মারা যায় তাদের শতকরা ৮০ ভাগের বয়স ১৫ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে। এভাবে অকাল মৃত্যুতে ঢলে পড়ছে দেশের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর এক উল্লেখযোগ্য অংশ। চিকিৎসার পাশাপাশি রোগ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিই পারে আমাদেরকে এই ক্ষয় রোগ থেকে মুক্তি দিতে।

যক্ষা রোগের জীবাণু শরীরের যে কোন অংগকেই আক্রমণ করতে পারে। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই আক্রান্ত হয় ফুসফুস। তাই আক্রান্ত রোগীর কফের সাথে যক্ষার জীবাণু বের হয় পরে তা শুকিয়ে বাতাসের মাধ্যমে ছড়ায়। এই জীবাণু নিঃশ্বাসের সাথে দেহে প্রবেশ করে যক্ষা রোগের সৃষ্টি করে।

রোগের লক্ষণ

আক্রান্ত রোগী দীর্ঘদিন যাবত খুস্‌খুসে কাশিতে ভুগতে পারে। ধীরে ক্ষুধামান্দ্য, ওজন কমে যাওয়া ও সন্ধ্যার দিকে অল্প জ্বর হয়ে থাকে। ঠিকমত চিকিৎসা না হলে শেষের দিকে কা সংগে রক্ত যাওয়া, ফুসফুসে পানি জমা, শ্বাসকষ্ট, বুকে ব্যাথা ই নানা ধরনের অসুবিধা দেখা দেয়। এমনকি রোগীর মৃত্যুও হতে পা ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ জ্বর আসা, খাওয়ার অরুচি, ও কমে যাওয়া এসব লক্ষণ দেখা যায়। খুব কম শিশুরই কাশির স রক্ত যায়। যক্ষা রোগ সাধারণতঃ বড়দের থেকেই ছোটদের মা সংক্রমিত হয়ে থাকে।

রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা

উপরে বর্ণিত লক্ষণগুলো কারোর মাঝে দেখা গেলে এবং তার আশপা আক্রান্ত রোগী থাকলে এ থেকে রোগ সম্পর্কে সন্দেহ করা যা পরে বুকের রঞ্জনরশ্মি (এক্স-রে), কফে জীবাণু পরীক্ষা ও রক্ত পরীক্ষ মাধ্যমে এ রোগ নির্ণয় করা যায়। বুকের রঞ্জনরশ্মি ও কফে জী সনাক্তকরণের মাধ্যমে গ্রামে ও লোকালয়ে যক্ষায় আক্রান্ত রোগীদের সনাক্ত করা যায়।

দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা করতে হয় বলে নিয়মিত ঔষধ সেবন এ রোগীর ও স্বাস্থ্যকর্মীর সমবেত প্রচেষ্টা ছাড়া এ রোগ নিরাময় স নয়। একই ঘরে অথবা পড়শীদের মধ্যে সম্ভাব্য রোগী খুঁজে বে করে উপযুক্ত চিকিৎসা না দিলে একই রোগীর পুনরায় আক্রান্ত হ সম্ভাবনা থাকে।

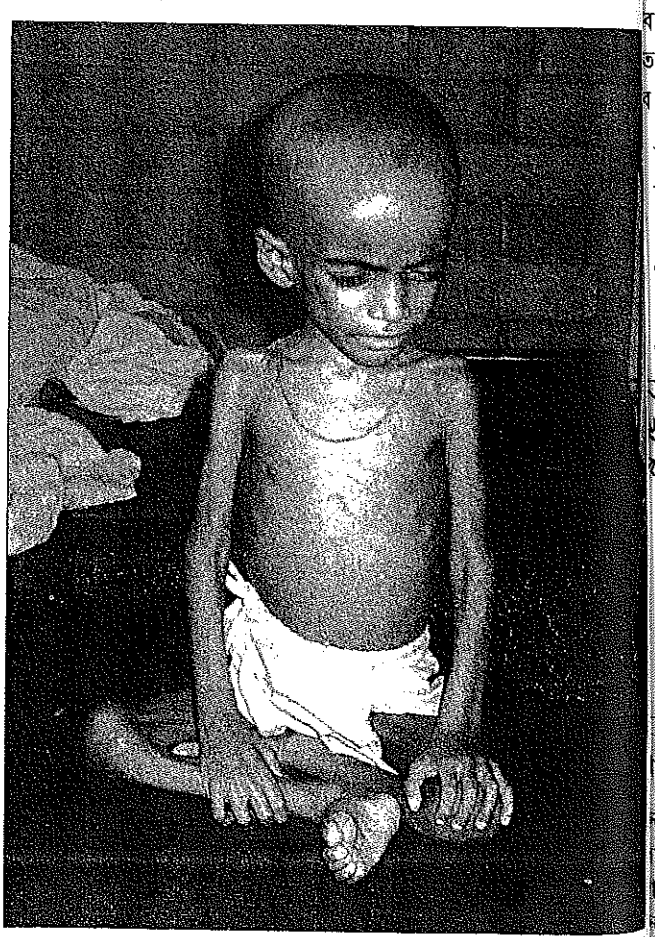

চিকিৎসার শুরুতে। ওজন : ৬.৪ কেজি

ORS

Saving a million lives each year

জেনে রাখা ভাল

অগ্নিদগ্ধ হলে কি করবেন?

বাংলাদেশে অগ্নিকান্ডজনিত দুর্ঘটনায় প্রতিবছর বহুলোকের মৃত্যু ঘটে, আহত হয় হাজার হাজার লোক। অগ্নিকান্ডের ফলে আহত লোকদের চিকিৎসা সম্ভব হলে অনেক মূল্যবান প্রাণ রক্ষা পেতো। বিশেষ করে বাড়ীতে, কল-কারখানায় ছোট খাট অগ্নিকান্ড ঘটছে প্রতিনিয়ত। ছোট খাট অগ্নিকান্ড যেমন ঃ রান্না-বান্নার সময়, গরম ইস্ত্রি হতে অথবা ফুটন্ত গরম পানিতে হাত-পা অথবা শরীরের অংশবিশেষ পুড়ে যেতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় কাপড়ে আগুন ধরে যায়। এসব ক্ষেত্রে আপনার করণীয় :

হাতে পায়ে আগুন ধরলে অগ্নিদগ্ধ হাত-পা ঠান্ডা পানিতে ডুবাতে হবে। ঘরে সাপ্লাইয়ের পানি থাকলে হাত বা পা পানিতে ডুবিয়ে পানির কল ছেড়ে দিন। আর বাড়ীতে সাপ্লাইয়ের পানি না থাকলে অন্য পাত্র হতে ঠান্ডা পানির ধারা ঢেলে দিতে হবে। কমপক্ষে ১০ মিনিট পানি ঢালতে হবে। পাশাপাশি মোটা ভারী কাপড়ের আস্তরণ পানিতে ভিজিয়ে অগ্নিদগ্ধ স্থান আবৃত করতে হবে।

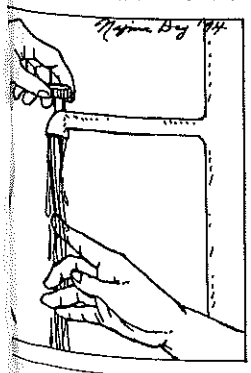

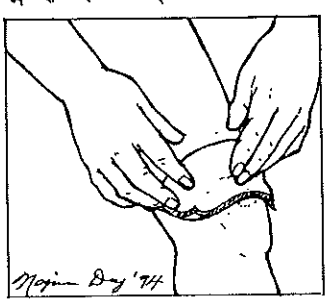

কাপড়টি যাতে শুকিয়ে না যায় তার জন্য হালকা পানির ছিটা দেয়া যেতে পারে।

* পরে অগ্নিদগ্ধ স্থানটি পরিস্কার কাপড় দিয়ে (ড্রেসিং কাপড় হলে ভাল হয়) হালকাভাবে পেঁচিয়ে অথবা চাপা দিয়ে ব্যান্ডেজ করতে হবে যেন অগ্নিদগ্ধ স্থানটি ভালমত ঠান্ডা হয়।
* কোন অবস্থাতেই কোন প্রকার লোশন অথবা মলম ব্যবহার করা যাবে না।
* রোগীর পরিধেয় কাপড়-চোপড়ে আগুন ধরে গেলে কোন অবস্থাতেই দৌড়িয়ে অন্যত্র যাওয়া যাবে না। এতে আগুনের তীব্রতা আরও বেড়ে যাবে।
* কাপড়ে আগুন ধরলে রোগীকে দ্রুত মেঝে বা মাটিতে শুইয়ে দিতে হবে। এরপর তোয়ালে, পর্দা, নরম বিছানা, চাদর অথবা অন্য কোন কাপড় দিয়ে হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তাই দিয়ে শরীর চেপে ধরতে হবে। রোগীর মুখে যাতে আগুন লাগতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। রোগীর শরীর কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে দিতে হবে। কিন্তু রোগীকে গড়াগড়ি করতে দেয়া যাবে না, এতে শরীরের অন্য অংশ অগ্নিদগ্ধ অংশের সংস্পর্শে এসে ক্ষতের সৃষ্টি করবে।
* আগুন নিভে গেলে শরীরের আবৃত কাপড় আস্তে আস্তে খুলে ফেলতে হবে। অগ্নিদগ্ধ স্থানে অন্য কোন পদার্থ আটকে গেলে তা ছাড়িয়ে নিতে হবে। যাতে আর কোন ক্ষতের সৃষ্টি না হয়।
* অগ্নিদগ্ধের ফলে মারত্মক ক্ষত সৃষ্টি হলে রোগীকে মেঝেতে বা মাটিতে শুইয়ে দিয়ে রোগীর অগ্নিদগ্ধ পা উপরের দিকে কিছুটা উঁচু করতে হবে যাতে বেশী মাত্রায় ফুলে যেতে না পারে। এক্ষেত্রে পায়ের নিচে বালিশ, কম্বল বা অন্য কোন কাপড় দেয়া যেতে পারে। হাত অগ্নিদগ্ধ হলে অন্য কোন বস্তুর উপর হাত রেখে উঁচু করে রাখতে হবে।

* প্রাথমিকভাবে অগ্নিদগ্ধ রোগীর চিকিৎসা করার পর রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে বা নিকটস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রেরণ করতে হবে অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। রোগীকে স্থানান্তরের জন্য এ্যাম্বুলেন্সের সাহায্য নিতে পারেন। মনে রাখতে হবে, অগ্নিদগ্ধের ফলে শরীরে মারাত্মক ক্ষতের সৃষ্টি হলে (severe burn) রোগী শকে (shock) যেতে পারে। সুতরাং রোগীর ক্ষত বেশী হলে রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে প্রেরণ করা জরুরী।

সংগ্রহ ঃ ডাঃ মোড়ল নজরুল ইসলাম

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান উপদেষ্টা ঃ অধ্যাপক ডেমিসি হাবতে; সম্পাদক ঃ ডাঃ ফকির আঞ্জুমান আরা; ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ঃ এম. শামসুল ইসলাম খান; কনসালটেন্ট এডিটর ঃ ডাঃ মোড়ল নজরুল ইসলাম; সদস্য ঃ ইউসুফ হাসান, ডাঃ এ.এস.এম. মিজানুর রহমান, মুজিবুর রহমান ও ডাঃ তানজিনা মির্জা; সার্কুলেশন ম্যানেজার ঃ হাসান শরীফ আহমেদ; আর্টিষ্ট ঃ আসেম আনসারী। প্রকাশক ঃ আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আই.সি.ডি.ডি.আর.,বি), জিপিও বক্স ১২৮, ঢাকা ১০০০।
ফোন ঃ ৬০০১৭১-৮, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৮৩১১৬, টেলেক্স ঃ ৬৭৫৬১২ আই.সি.ডি.ডি. বি.জে।

মুদ্রণে ব্র্যাক প্রিন্টার্স ঢাকা বাংলাদেশ

স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যেতে উদ্বুদ্ধ করা। আক্রান্ত রোগীর সাথে বসবাসকারী প্রত্যেককে পরীক্ষা করা উচিত তাদের মধ্যেও এ রোগ সংক্রমিত হয়েছে কিনা তা দেখার জন্য। এছাড়াও ব্যাপকভাবে নির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে বড়দের কফে জীবাণু পরীক্ষা এবং ছোটদের বিসিজি টিকার মাধ্যমে কোন এলাকায় যক্ষা রোগী আছে কিনা নির্ণয় করা যেতে পারে।

এসব রোগীকে সনাক্ত করার পর প্রধান কর্তব্য হলো তাদের চিকিৎসা নিশ্চিত করা। বিশেষ জরুরী হল, যাদের কফে জীবাণু পাওয়া গিয়েছে তাদের দিকে নজর দেয়া এবং তাদেরকে স্বাস্থ্য শিক্ষা দেয়া। এসব রোগীদের কফ যেখানে সেখানে না ফেলে একটা নির্দিষ্ট পাত্রে ফেলে পরে তা নির্দিষ্ট গর্তে পুঁতে ফেলতে হবে অথবা মাটি বা বালু দিয়ে চাপা দিতে হবে। কাশির সময় মুখে রুমাল ব্যবহার করতে হবে। খাওয়ার বাসন-গ্লাস আলাদা করে নেয়া উচিত। ছোট বাচ্চাদেরকে মুখের কাছে নিয়ে আদর করা উচিত নয়।

বিসিজি টিকা দেয়ার ব্যবস্থা প্রায় সব মাতৃসদনে আছে। তাছাড়া সরকারের সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচীর আওতায় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও বিসিজি টিকা দেয়া হয়। পরিশেষে বলা যায়, মারাত্মক ব্যাধি যক্ষাকে জয় করার উপায় আমাদের জানা আছে, তবে এর জন্য প্রয়োজন সকলের সমবেত প্রচেষ্টা। তাই আর সময় নষ্ট না করে চলুন সবাইকে এই মারাত্মক রোগ সম্বন্ধে সচেতন করে তুলি।

রোগীরা যাদের সাহায্য পেতে পারেন

বাংলাদেশের সকল সরকারী হাসপাতালে উপযুক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে যক্ষা রোগের চিকিৎসা করা হয়ে থাকে। এছাড়া ঢাকাস্থ মহাখালী বক্ষব্যাধি হাসপাতাল, শ্যামলী টিবি ক্লিনিক ও চানখারপুল যক্ষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং বিভিন্ন জেলা পর্যায়ের যক্ষা চিকিৎসা কেন্দ্রসমূহে রোগীরা চিকিৎসা পেতে পারেন। বাংলাদেশের যক্ষা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে নিয়োজিত সংগঠন নাটাব (NATAB)-এর বিভিন্ন চিকিৎসা কেন্দ্রের সহযোগিতায়ও রোগীরা চিকিৎসা পেতে পারেন।

দিনা সরেনসেন

চিকিৎসা শুরুর ৬ মাস পর। ওজন : ১১ কেজি

স্বাস্থ্য কুইজ-৭-এর উত্তর

১. নবজাতকের ধনুষ্টংকার প্রতিরোধ করা যায় :
— গর্ভাবস্থায় মাকে একমাস অন্তর ২টি ধনুষ্টংকারের প্রতি... টিকা দিলে
— প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাই দ্বারা গর্ভখালাস করালে
— নাভী কাটার যন্ত্রটা জীবাণুমুক্ত হলে
— সন্তান ধারণে সক্ষম সকল মহিলাকে ধনুষ্টংকারের ... দিলে।

২. পাঁচটি ভিটামিন 'এ' যুক্ত খাবার হল :
— পালং শাক, গাজর, দুধ, ডিম, মিষ্টি কুমড়া।

৩. জ্বরের প্রাথমিক চিকিৎসা :
— কোন ব্যক্তির জ্বর হলে তার শরীরে হালকা পাতলা কা... দিয়ে রাখতে হবে। কখনও কাঁথা, কম্বল, লেপ দিয়ে ঢা... উচিত নয়।
— জ্বর হলে প্রচুর পরিমাণে পানি, ফলের রস বা যে কো... তরল পানীয় পান করা উচিত।
— জ্বর কমানোর জন্য প্যারাসিটামল বড়ি বা সিরাপ দে... যায়।
— জ্বরের কারণ নির্ণয় ও চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের পরাম... নিলে ভাল হয়।

৪. গর্ভাবস্থায় স্বাভাবিক রক্তচাপ হল ১২০/৮০ মিলিমিটার মারকারি... গর্ভকালীন সময় রক্তচাপ ১৪০/৯০-এর বেশী হওয়া বিপজ্জনক...

৫. ২ বৎসরের কম বয়সের শিশুদের প্রতিবার পাতলা পায়খানা... পর অন্তত: ৫০ থেকে ১০০ মিলিলিটার খাবার স্যালাইন দি... হয়।

স্বাস্থ্য কুইজ-৭-এর সঠিক উত্তরদাত্রীর নাম :
আফরোজা পারভীন, প্রযত্নে : জিল্লুর রহমান, গ্রাম + পোস্ট: কাজিপাড়া, দিনাজপুর

স্বাস্থ্য কুইজ-৮

১. একজন গর্ভবতী মহিলার বর্তমান গর্ভাবস্থায় কোন সমস্যা নেই। কিন্তু প্রশ্ন করে জানা গেল যে পূর্ববর্তী গর্ভাবস্থায় রক্তক্ষরণ হয়েছিল। এই মহিলাকে কি ধরনের গর্ভবতী হিসেবে দেখবেন?
২. নবজাতকদিগকে সবকটি টিকা ৬ সপ্তাহের মধ্যে দেয়া হয়, কিন্তু হামের টিকা নয় মাস পর দেয়া হয় কেন?
৩. কোন ধরনের ডায়রিয়ায় আমাদের দেশের শিশুরা বেশী আক্রান্ত হয়? ইহার প্রাথমিক চিকিৎসা কি?
৪. একজন মহিলা কি কি অবস্থায় ৬ মাস পর্যন্ত পরিবার পরিকল্পনার কোন পদ্ধতি না নিয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ করতে পারেন?
৫. জন্মনিয়ন্ত্রণের খাবার বড়ি ও ইনজেকশন ব্যবহার করার ক্ষেত্রে মহিলাদের বয়স কি বিবেচনা করা হয়? যদি করা হয় তবে সেটি কোন ক্ষেত্রে?

(উত্তর আমাদের কাছে ২০শে জুন ১৯৯৪ তারিখের পূর্বে পৌছাতে হবে।)